

লালন ফকির : হিন্দু কি যবন

গহন পরিচয় উদঘাটন করার ক্ষমতা নেই। লালন ফকিরের যে পরিচয় সকলে জানেন সেটা আবার নতুন করে উল্লেখ করছি। লালনের সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী চালু আছে। লালন জন্মেছিলেন ব্রাহ্মণ পরিবারে। সে পরিবারটি তীর্থ করতে যাওয়ার পথে ছোট বাচ্চাটি কলেরা বা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। সে অবস্থাতেই বাচ্চাটিকে নদীর পাড়ে রেখে পরিবারটি পালিয়ে আত্মরক্ষা করে কিংবা মারাত্মক প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগের শিকার হয়ে মারা পড়ে, সঠিকভাবে জানা যায়নি। এই অরক্ষিত শিশুটিকে এক মুসলমান জোলা মহিলা বাড়িতে নিয়ে পুত্রস্নেহে লালনপালন করেন। এবং লালন নামটি তাঁরই দেওয়া। লালন বড় হয়ে পালকি-বেহারার কাজ করতে থাকেন। লালন যাকে বারবার তাঁর শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু বলে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন সেই সিরাজ শাঁইও ছিলেন একজন পালকি বাহক।

এখানে একটি ছোট প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন ক্ষিত্তিমোহন সেন। তিনি ভারতের নির্যাতিত সম্প্রদায়সমূহ থেকে যে সকল বিশাল বিশাল মানুষের উত্থান ঘটেছে, তাঁদের কারো কারো ওপর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ রচনা করেছেন। সন্ত কবীরের ওপর তিনি অত্যন্ত খেটেখুটে একটি চমৎকার বই লিখেছেন। কবীরের অনেকগুলো দোহার তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত বাংলা অনুবাদ করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষিত্তিমোহন সেনের সংগ্রহ থেকে কবীরের ১০০টি দোহার ইংরেজী অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। চর্মকার সম্প্রদায় থেকে আগত দাদুর ওপরও ক্ষিত্তিমোহন সেন একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন। (আমার স্মৃতি যদি আমাকে প্রতারণা না করে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ গ্রন্থের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা লিখেছিলেন। ঐ ‘দাদু’ গ্রন্থে ক্ষিত্তিমোহন বাবু একটা মজার জিনিস খুঁজে বের করেছেন। ক্ষিত্তিবাবু দেখিয়েছেন দাদুর আসল নাম ছিল ‘দাউদ’। দাউদ নামটি মুসলমান-মুসলমান শোনায়ে বলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা পাণ্টে তাঁর নাম রেখেছিলেন ‘দাদু’। লালন এবং কবীরের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে যে কাহিনীটা চালু আছে দাদুর বেলায়ও অনুরূপ একটা কাহিনী ব্রাহ্মণরা তৈরি করে দিয়েছিলেন। দাদু

ব্রাহ্মণ সন্তান। চর্মকার পিতামাতার ঘরে প্রতিপালিত হয়েছিলেন।

ক্ষিত্তিমোহনবাবু তাঁর ‘দাদু’ গ্রন্থে একটা বিষয় খুব জোর দিয়ে উচ্চারণ করেছেন। নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি যখন জ্ঞান এবং মনীষার বলে চারপাশ আলোকিত করেন, উঁচুবর্ণের লোকেরা অত্যন্ত সুকৌশলে নিম্নবর্ণের মানুষদের থেকে উদ্ধৃত মহাপুরুষদের নিজেদের সম্প্রদায়ের পাটাতনের ভেতরে হিনতাই করে নিয়ে যান। ভারতের নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে এমন সব শ্রেষ্ঠ মানুষদের উদ্ভব ঘটেছে, বুদ্ধির দীপ্তি, প্রতিভার অলোকসামান্যতা এবং জ্ঞানের গভীরতায় তাঁদের বেদ-উপনিষদের ঋষিদের চেয়ে খাটো করে দেখার উপায় নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, যে সকল নির্যাতিত সম্প্রদায় তাঁদের জন্ম সম্ভাবিত করেছে, তারা এই মহামানবদের নিজেদের মানুষ বলে অনেকদিন পর্যন্ত দাবী করতে পারেনি। উঁচুবর্ণের লোকেরা তাঁদের নাম-পরিচয় ঠিকুজি-কুলুজি সব পাণ্টে ফেলেছেন। লালনকে হিন্দুরা যেমন দাবী করে হিন্দু, মুসলমানরা মনে করে তিনি ছিলেন তাদের স্বজাতিভুক্ত। এখনো পর্যন্ত এ বিতর্কের কোনো সমাধান হয়নি — লালন ফকির ‘হিন্দু’ কি ‘যবন’?

লালন ফকির অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের মানুষ। তিনি কোথায় জন্মেছিলেন জানা না গেলেও কুষ্টিয়া ছিল তাঁর সাধনক্ষেত্র। অবিভক্ত বাঙলায় কুষ্টিয়া নদীয়া জেলার একটি মহকুমা হিসেবে পরিচিত ছিল। নদীয়া ছিল এক সময়ের বাঙলার সাংস্কৃতিক রাজধানী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জন্মেছিলেন এই নদীয়ায়। চৈতন্যদেব কলম দিয়ে একটি বাক্য না লিখেও সারা বাঙলায় একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। গোটা নদীয়া (কুষ্টিয়াসহ) অঞ্চলটা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জায়গা। ধর্মচিন্তা এবং সংস্কৃতিচিন্তা এখানে তরঙ্গের মতো উঠেছে এবং আশপাশের অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। কুষ্টিয়ার কুমারখালী এলাকায় বাস করতেন ‘বিষাদ-সিন্ধু’র লেখক মীর মশাররফ হোসেন। ‘গ্রামবার্তা’ প্রকাশক এবং সম্পাদক কাঙাল হরিনাথ কুষ্টিয়াতেই বাস করতেন। তিনি মীর মশাররফ এবং লালন উভয়েই বন্ধু ছিলেন। কাঙাল হরিনাথের কাছ থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে মীর মশাররফও কিছু গান লিখেছিলেন। আর কাঙাল হরিনাথ ছিলেন অত্যন্ত নম্র ব্যক্তি। তিনি তাঁর ‘গ্রামবার্তা’ পত্রিকায় স্থানীয় জমিদাররা কৃষক প্রজাদের ওপর যে নির্মম অত্যাচার চালাতেন সেগুলো তুলে ধরতেন এবং প্রজা সাধারণকে এই জুলুমবাজির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য প্রাণিত করতে চেষ্টা করতেন। কুষ্টিয়ার শিলাইদহ অঞ্চলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের জমিদারী ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাবা দেবেন্দ্রনাথের আমলে বিদ্রোহী প্রজাদের শাস্তোত্তর করার জন্য নানারকম পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল। একবার ঠাকুরবাড়ীর কাচারী থেকে পাইকদের পাঠানো হয়েছিল ‘গ্রামবার্তা’ পত্রিকার সম্পাদক কাঙাল হরিনাথকে ধরে আনার জন্য। এই সংবাদ লালনের কাছে যায়। লালন যখন জানতে পারলেন তাঁর বন্ধুকে ধরে নেওয়ার জন্য ঠাকুর মশাইদের কাচারী থেকে পাইক পাঠানো হয়েছে, তিনি তাঁর শিষ্যদের অনুরোধ করলেন এই

পাইক-পেয়াদাদের যেন পিটিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। লালন সম্পর্কে এ ধরনের অনেক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে যাওয়া-আসা করতেন, তখনও লালন জীবিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলতে পারেননি। অবশ্য এ কথা ঠিক, রবীন্দ্রনাথ নিজে উদ্যোগী হয়ে লালনের কিছু গান সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলো 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম লালনকে বাঙলার শিক্ষিত লোকদের সামনে তুলে ধরেন। লালনের যে প্রতিকৃতি এখন সব জায়গায় ছাপা হয় সেটা এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি মন থেকে ছবিটি এঁকেছিলেন নাকি লালনের হুবহু প্রতিকৃতি তৈরি করেছিলেন, জানার উপায় নেই।

লালনের সময়ের বিষয়ে আরো কিছু কথাবার্তা বলা প্রয়োজন। যশোর অঞ্চলে জমিরুদ্দীন নামক এক মুসলমান খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে পাদ্রী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি লোকজনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য নানারকম উদ্যোগ-আয়োজন করতে থাকেন। সমাজে তার ভয়ানক প্রতিক্রিয়া হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ পাদ্রী জমিরুদ্দীনের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে বাধা দেওয়ার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা ছিলেন এবং একটা সময়ে মিশনারিদের ধর্মপ্রচার বন্ধ করতে হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহর অনুসারীরা পাদ্রী জমিরুদ্দীনের বিরুদ্ধে যেমন খড়গহস্ত হয়ে মাঠে নেমেছিলেন, একইভাবে বাউলদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে তৎপর হয়ে ওঠেন। অবশ্য এই প্রয়াসের সঙ্গে মুন্সী মেহেরুল্লাহ কিংবা তাঁর প্রত্যক্ষ সঙ্গীসাথীরা কতদূর যুক্ত ছিলেন সঠিকভাবে জানার উপায় নেই। তবে এ কথা ঠিক যে, সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত আলেমদের একটা অংশ একাটা হয়ে বাউল-দমন ফতোয়া জারি করেছিলেন। তার ফলে অনেক সহিংস ঘটনাও ঘটে। গোঁড়া আলেমরা বাউলদেরকে লা-শরা-সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করতে চেষ্টার ক্রটি করেননি। বাউলরাও তাঁদের মতবাদ এবং তত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণ করার জন্য সভা-সমিতির আয়োজন করতেন। মাঝে মাঝে বাহাসের অনুষ্ঠানও করা হত। খুব সম্ভবত ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে লালন যে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তার পেছনের কারণ ছিল সুন্নী-আলেমদের মারমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি নির্মাণ করার তাগিদ।

২

বেশ কিছুদিন থেকে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকেই একটা জিনিস প্রমাণ করতে চান, বাউলতত্ত্ব একমাত্র বাংলাদেশেরই একান্ত আপন গহন, আধ্যাত্মিক সম্পদ। এই মনোভাবের মধ্যে কিছুটা বাড়াবাড়ির প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। বাউলরা যে ধরনের তত্ত্ব এবং মতবাদে বিশ্বাস করেন সারা ভারতে এ ধরনের মতবাদ এবং তত্ত্বের অনুসারী আরো নানা সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠী রয়েছে। আমার ধারণা বাউলতত্ত্বের সঙ্গে বৌদ্ধ-

দর্শনের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান। এদেশে বৌদ্ধধর্ম যখন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলো, সেই আপৎকালীন সময়টিতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ নিজেদের আত্মপরিচয় গোপন করার জন্য নানারকম ছদ্মবেশে আশ্রয় নিতে থাকেন। বাঙলা অঞ্চলে নাথপন্থী সাধকেরা যে সাধনপদ্ধতি চালু করেছিলেন এবং তাঁরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন তার মধ্যে বৌদ্ধ শূন্যবাদের প্রভাব অতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বাউলদের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে নাথপন্থী সাধকদের চিন্তাভাবনার আশ্চর্য একটা সায়ুজ্য বর্তমান। বাঙলার নাথপন্থীদের মতো ভারতের আরো নানা অঞ্চলে নিম্নবর্ণের নানা পেশা এবং বৃত্তির লোকদের মধ্যে ছদ্মবেশী বৌদ্ধ মতবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বেনারসের সন্ত কবীর ছিলেন পেশায় লালনের মতো একজন জোলা। তিনি হিন্দু-মুসলমান এ দুই প্রবল সম্প্রদায়ের বিরোধিতাপূর্ণ মনোভাবের কোনো এক পক্ষকে সমর্থন না করে সম্পূর্ণ একটি নতুন পথ কাটার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কবীর যে দোহাগুলো রচনা করে গেছেন, আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি, লালনের অনেকগুলো গান আক্ষরিক অর্থে সেই দোহাগুলো থেকে উঠে এসেছে। এরকম গানের সংখ্যা একটা-দুটো নয়, একশোরও বেশি। এই বিপুলসংখ্যক গানের কোনরকমের শব্দ কিংবা অর্থবিকৃতি ব্যতিরেকে লালনের রচনায় উঠে আসার পেছনে একটি কারণই বর্তমান। তা হলো এই যে, বাউল-সাধনার ধারাটি সমগ্র ভারতে প্রবাহমান ছিল। লালন-শিষ্য দুদু শাহের একটি গানে এরকম উল্লেখ আছে —

আমি লালনের সিঁড়ি
ভাইবন্ধু নাই আমার জড়ি।

আরো একটি বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তন্তুজীবী সমাজের সঙ্গে বাউলদের একটা অঙ্গঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। তন্তুজীবী সম্প্রদায়ের পেশা হচ্ছে বস্ত্র বয়ন করা। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা বস্ত্র বয়ন করেন তাদেরকে তাঁতি বলা হয়। নামের শেষে নাথ কিংবা দেবনাথ পদবী তাঁরা ব্যবহার করেন। এই তাঁতিরা গোড়ার দিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে বিবেচিত হত না। তাদের আহার-বিহার, পূজা-অর্চনা এবং সামাজিক আচার-বিচারের ধরনও হিন্দু সমাজের চাইতে আলাদা। এই অল্প কিছুদিন আগেও নাথ বা যুগীদের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়াও হিন্দুদের চাইতে ভিন্নভাবে সম্পন্ন হত।

সাধারণত হিন্দুরা দাহ করার মধ্য দিয়ে মৃতদেহের সৎকার করে। নাথ বা যুগীরা তাদের মৃতদেহ সমাধিস্থ করে। অবশ্য এই সমাধিস্থ করার প্রক্রিয়াটি মুসলমানদের কবর দেয়ার অনুরূপ নয়। অতি সাম্প্রতিককালে নাথ সম্প্রদায় এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী ভেদরেখাগুলো অনেকটা মুছে যাওয়ার উপক্রম। সে যা হোক, এই ভূখণ্ডে ইসলামের আগমনের পর ব্যাপকভাবে যুগীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ধর্মান্তরিত নাথ সম্প্রদায়ের লোকরা জোলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ধর্মের পরিবর্তনের কারণে তাদের পেশার পরিবর্তনের কোনো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়নি।

এটা শুধুমাত্র বাঙলার ব্যাপার নয়। বাঙলার বাইরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। লালন বোধকরি সবচাইতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সন্ত কবীরের দৃষ্টান্তে। এই রচনার এক জায়গায় বলা হয়েছে লালনের অনেকগুলো গানই কবীরের দোহাগুলোতে যে ধরনের অনুভূতি এবং ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত হয়েছে অবিকল তারই প্রতিধ্বনি। কবীর জন্মেছিলেন কাশীর কাছাকাছি কোনো একটি গ্রামে এবং পেশায় ছিলেন একজন তন্তবায়।

এ পর্যন্ত এমন কোনো সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা আমার চোখে পড়েনি যেখানে পেশাগত ভূমিকা উল্লেখ করে বাউলদের সাধনার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষকরা যদি এদিকটোতে দৃষ্টি দেন আমার বিশ্বাস বাউল-সাধনার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক নতুন কথা বলা সম্ভব হবে। বাউলদের সঙ্গে পেশাগতভাবে তাঁতি সম্প্রদায়ের একটি নিকট-সম্পর্ক রয়েছে এবং বৌদ্ধ মতবাদের সঙ্গে একটা দূরবর্তী অচ্ছেদ্য সম্পর্ক অদ্যাবধি বাউল-সাধকরা রক্ষা করে যাচ্ছেন। বাউলদের চিন্তা-চেতনা কম্পাসের কাঁটার মতো সবসময়ে শূন্যবাদের দিকে হেলে থাকে। এ জগৎ শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে, শূন্যের মধ্যে মিলিয়ে যাবে — এ পরমশূন্যতা একেই বাউলতাত্ত্বিকরা কখনো পরম শাঁই, নিরঞ্জন এ সকল নামে অভিহিত করেছেন। দার্শনিকভাবে বাউলতত্ত্বের মধ্যে গতিশীল সত্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও সামাজিকভাবে বাউলতত্ত্ব হলো পরাজিত মানুষদের দর্শন। একটা বিরাট সংখ্যক মানবগোষ্ঠী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে পরাজিত হয়েছে, তথাপি পরম অনুরাগে সে বিশ্বাসটি আঁকড়ে থাকার অনমনীয় সংকল্প তাঁরা সবসময় প্রদর্শন করেছেন। সামাজিক একক হিসেবে টিকে থাকার জন্য প্রভাবশালী সমাজ-প্রপঞ্চসমূহের সঙ্গে কখনো আপোস করেছে, কখনো তাদের কাছ থেকে কিছু কিছু উপাদান গ্রহণ করেছে। কিন্তু নিজেদের বিশ্বাস এবং আস্থার স্থিতিবিন্দুটি কখনো নিঃসৃত হয়নি।

লালনের পূর্বে বাউল ছিল, পরেও বাউল ছিল। কেননা বাউল-সাধনা এই অঞ্চলের পরিবাণ্ড একটি আধ্যাত্মিক সম্পদ। বাউলরা তাঁদের গানে যে সমস্ত কথা বলে থাকেন সেগুলোর দূরকম মানে হয়। সাধারণ মানুষ বাউলদের গান থেকে এক ধরনের অর্থ আবিষ্কার করে, কিন্তু বাউলরা নিজেরা নিজেদের মতো করে এ গানগুলোকে ব্যাখ্যা করে থাকেন। বাউলদের নিজস্ব একটি পরিভাষা রয়েছে, যার অর্থ পূর্ব থেকে জানা না থাকলে অন্য কারো পক্ষে উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। যেমন লালনের গানে বাঁকা নদী, সুখ-সরোবর, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, চাঁদ ইত্যাদি যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর সঙ্গে নরনারীর, বিশেষ করে নারীর শরীরতত্ত্বের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। এ সকল বিষয় নিয়ে লালনের পূর্বের বাউলরা অনেক গান লিখেছেন। লালনের পরবর্তী বাউলরাও লিখেছেন। অদ্যাবধি এ প্রক্রিয়া সমানে সক্রিয় রয়েছে। এ রচনায় লালন ফকির এবং তাঁর মতবাদ সম্পর্কে সব কথা গুলিয়ে বলা সম্ভব হয়নি। অনেক বক্তব্য অপরিষ্কৃত এবং অবগুপ্তিত থেকে গিয়েছে। ধর্মতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক অনুসন্ধানসমূহ

যথাযথ প্রয়োগ করলে লালন সম্পর্কে কতিপয় যুৎসই মন্তব্য করা হয়তো সম্ভব হত কিন্তু বুকপিঠ দুই দিকেই প্রচণ্ড চাপ নিয়ে এ ধরনের একটি রচনা লেখার চেষ্টা অনেক কিছুকেই গুলিয়ে ফেলে, অনেক সময় কলমের মুখে সঠিক বক্তব্যটি উঠে আসতে চায় না। এসব সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েও লালন সম্পর্কে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি। লালন ফকির বাউল ছিলেন, এ বিষয়ে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু লালন একজন বাউলের চেয়েও অধিক কিছু ছিলেন এবং লালন কি কারণে অন্য বাউলদের চাইতে আলাদা — সে বিষয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। প্রথম কথা হলো লালন ছিলেন একজন জাহ্নত প্রতিভা। জগৎ এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করার একটি সাহসী দৃষ্টিভঙ্গী তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। যখনই মানবিক সমস্যা-সংকটসমূহ তাঁর চিন্তা-কল্পনার উপজীব্য হয়েছে সেগুলো আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত হয়ে উঠতে পেরেছে। লালন ছিলেন শক্তিমান কবিসত্তার অধিকারী এবং অত্যন্ত জ্ঞানী একজন মানুষ। তাঁর কাব্যবোধ ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম। উপমা-অলঙ্কার তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রয়োগ করতে পারতেন। সহজভাবে সহজ কথা বলার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁকে অনন্যসাধারণ করে তুলেছিল। তাঁর কাণ্ডজ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বে তাঁর অধিকার ছিল। আধুনিক যে সকল জীবন-জিজ্ঞাসা উনবিংশ শতাব্দীর সময় থেকে বাঙলায় প্রসারলাভ করেছিল কুষ্টিয়ার এ পালকিবাহক ভদ্রলোকটি সেগুলো সম্পর্কে অপরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না। জ্ঞান এবং কবিসত্তার সম্মিলন লালনকে এমন একটা উচ্চতর স্তরে নিয়ে গেছে, হিসেব করলে দেখা যাবে বাঙলার সর্বযুগের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাধকদের মধ্যে লালনের একখানি আসন প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়। এদিক দিয়ে দেখলে পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে লালনের একটা তুলনা চলে। দুজনে একই সময়ের মানুষ। লালন এবং রামকৃষ্ণের যখন আগমন ঘটেছে সে সময়ে বাঙলা দেশ নবযুগে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম এবং তারপর রবীন্দ্রনাথ এসে গেছেন। নতুন যুগের মর্মবাণী একেবারে সাদামাটা গ্রাম্য বামন রামকৃষ্ণকে স্পর্শ করেছে, একথা লালনের বেলায়ও খাটে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে লালনের পার্থক্যের বিষয়টিও লক্ষ্য করার মতো। রামকৃষ্ণ ছিলেন উচ্চশ্রেণীর মানুষ, ব্রাহ্মণ। তাঁর সাধনার স্থলটি ছিল কলকাতার উপকণ্ঠে। বিবেকানন্দের মতো গনগনে উত্তপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণেরা দর্শন-জিজ্ঞাসা তাড়িত হয়ে রামকৃষ্ণের চারপাশে এসে ভিড় করেছিলেন। লালন ছিলেন কুষ্টিয়ার গণগ্রামের মানুষ। গ্রামের সীমানা ডিঙ্গানো লালনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শুধু লালন নয়, লালনের দীক্ষাগুরু সিরাজ শাঁইজীকেও অনেকদিন পর্যন্ত পালকী-বোহারার শ্রমসাধ্য জীবন কাটাতে হয়েছে। এই পরিবেশে বাস করেও প্রগাঢ় মনীষার অধিকারী হয়ে যশোরের নিজস্ব ভাষারীতিটি অনুসরণ করে হৃদয়ের যে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে তুলেছেন সেটা বিস্মিত হওয়ার মতো ঘটনা বটে। এটাও সত্য বৈষ্ণব-সাধকদের মধ্যে একটা মননসমৃদ্ধ চিন্তা-ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল। চণ্ডীদাস লিখেছিলেন 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার

উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই’। এবার লালনের একটা গানের দুটো পংক্তি উদ্ধৃত করি :

‘মিয়া ভাই কী কথা শুনাইলেন ভারী।
হবে না-কি কেয়ামতে আযাব ভারী
নর-নারী ভেস্তু মাঝার
পাবে কি সমান অধিকার
নরে পাবে হ্রের বহর
বদলা কি তার পাবে নারী?’

এই পংক্তিগুলো স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে লালন যখন লিখেছিলেন সেই সময়ে এই বেবাক বাঙলা মুলুকে কেউ নারীবাদের কথা উচ্চারণ করেনি। কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পয়সা নিয়ে লালনকে এই পংক্তিগুলো লিখতে হয়নি। চণ্ডীদাস এবং লালন উভয়েই মানবতাবাদী। কিন্তু চণ্ডীদাসের তুলনায় লালনের মানবতাবাদ অনেক বেশী বিশিষ্ট এবং কংক্রিট। চণ্ডীদাসে মানুষ এসেছে একটা আইডিয়া হিসেবে। মানুষের মধ্যে যে লিঙ্গভেদ রয়েছে সে জিনিসটি চিন্তা করার অবকাশ চণ্ডীদাসের হয়নি। তবে একথাও সত্য, চণ্ডীদাস অনেক আগের জমানার মানুষ। লালন ফকির নারী-অধিকার সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থকে চ্যালেঞ্জ করে কথা বলার যে ঝুঁকি গ্রহণ করেছেন সে ব্যাপারটি সকলকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। এ রচনাটি প্রায় শেষ করে এনেছি। আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকরা লালন ফকিরকে যে দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, তার মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ বা অনুরাগের ঘাটতি আছে, আমার তেমন মনে হয় না। কিন্তু তাঁকে একজন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মহান স্রষ্টা হিসেবে দেখার, বিচার করার মনোভাবটি অদ্যাবধি গড়ে ওঠেনি। আমরা লালনের সৃষ্টিকর্মকে লোকসাহিত্যের একটি অংশ হিসেবে বিচার করতে, দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। তার ফলে আমরা যখন লালনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি, সম্মান জানাই, তাতেও আমরা যে লালনের ওপর অবিচার করছি, সেটা নিজেরাই বুঝতে পারিনে।

একটা বেদনার কথা বলব। লালনের অবদান বিচার করার বেলায়ও আমাদের দেশের পণ্ডিতদের একটা শ্রেণীদৃষ্টির উৎকট প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। লালন একজন মহান সাধক, চিন্তা-ভাবনায় অগ্রসর এবং আলোকিত মানুষ। স্বভাবতই শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ দাবী করার যোগ্য। কিন্তু আমাদের একাডেমিক পরিমণ্ডলে লালনের এই মহত্ত্ব এবং উচ্চতা কি যথাযথভাবে বিচার করা হয়? সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মানুষের সৃষ্টিকর্মের পাশাপাশি আমরা কি লালনের সৃষ্টিকর্মের তুলনা করে থাকি?